গণপতির বাহনরূপে মূষিক : একটি ধারণা

কুনাল চক্রবর্তী

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম

সারসংক্ষেপ : পৌরাণিক দেব-দেবীদের মধ্যে অন্যতম হলেন গণেশ বা গণপতি । ইনি হিন্দু ধর্মের সর্বাধিক পূজিত দেবতা। প্রায় সকল হিন্দু সম্প্রদায়েই গণেশ বা গণপতির পূজা প্রচলিত রয়েছে। গণেশকে বিঘ্ননাশকারী, শিল্প ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক এবং বুদ্ধি ও জ্ঞানের দেবতারূপে পূজা করা হয়। এমনকী, অক্ষর ও জ্ঞানের দেবতারূপেও পূজা করা হয় গণেশকে। গণেশকে বিভিন্ন উপাধি ও বিশেষণে ভূষিত করা হয়। এই উপাধি বা বিশেষণের মধ্যে 'গণপতি' ও 'বিঘ্নেশ্বর' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিনায়ক নামটিও গণেশের একটি বহুল প্রচলিত নাম। এই নামটি পুরাণ ও বৌদ্ধ তন্ত্রগুলিতে বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। গণপতি নামটি গণেশের নামান্তর। গণ ও পতি এই শব্দ দু'টির মিলনের মাধ্যমে গণপতি শব্দটির উৎপত্তি। গণপতি শব্দটির উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে রচিত ঋগ্বেদ গ্রন্থের দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৩ তম সূক্তের প্রথম শ্লোকে। কেবলমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের নয়, জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেও গণেশ ভক্তিবাদ মিশে গিয়ে গণেশ পূজার প্রথা বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করেছে।

ভারতীয় শিল্পকলায় গণেশ একটি জনপ্রিয় চরিত্র। অন্যান্য দেবদেবীদের তুলনায় গণেশের মূর্তির মধ্যে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল বৈচিত্র ও স্বতন্ত্র নিদর্শন বেশি দেখা যায়। দন্ডায়মান, নৃত্যরত, দৈত্যনাশে উদ্যত, শিশুরূপে পরিবারের সঙ্গে ক্রীড়ারত, মাটিতে বা সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় অথবা বিভিন্ন ধরনের আধুনিক অবস্থায় তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে। পুরাণের দেবতাদের মূর্তিতত্ত্ব বর্ণনায় আমরা বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন বাহন প্রত্যক্ষ করি, গণেশ বা গণপতির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গণেশ বা গণপতির বাহনরূপে আমরা মূষিক বা ইঁদুরের উল্লেখ পাই। তবে গণেশের মূর্তির তাত্ত্বিক বর্ণনায় আমরা বাহনরূপে সর্বত্র মূষিক বা ইঁদুরের উল্লেখ পাই না। গুপ্ত যুগের প্রথম ভাগে ভিলসা উদয়গিরির চন্দ্রগুপ্ত গুহায় গণেশের যে উৎকীর্ণ চিত্রটি পাওয়া যায় সেই চিত্রে বাহনরূপে মূষিক অনুপস্থিত। দ্বাদশ শতকের পূর্বে দক্ষিণ ভারতীয় রীতিতে গণেশের বাহন রূপে মূষিকের অন্তর্ভুক্তি ছিল না। গণেশের মূর্তিতাত্ত্বিক উপস্থাপনার মূল সংযোজনগুলির মধ্যে মূষিক সর্বশেষ সংযোজন। আমি আমার এই গবেষণা পত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বাধিক দেবতা গণপতির মূর্তিতাত্ত্বিক বিবর্তনের আলোচনার পাশাপাশি কিভাবে এক ক্ষুদ্র প্রাণী মূষিক গণপতির বাহনরূপে সুপরিচিত হলেন সেই বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

সূচকশব্দ : গনেশ, গনপতি, বাহন, মূষিক, ইঁদুর, বিনায়ক, বিঘ্নেশ্বর, পৌরানিক দেবতা।

Society Language and Culture

হিন্দু ধর্মের সর্বাধিক পরিচিত ও সর্বাধিক পূজিত দেবতাদের মধ্যে গণেশ হলেন অন্যতম। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিনিধি হিসাবে গণপতি একটি উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী। মানবদেহ ও পশু তথা হস্তী মস্তকের একত্রীকরণ এই দেবতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি গণপতি, পিল্লাইয়ার, বিঘ্নেশ্বর, বিনায়ক, গজপতি একদন্ত ইত্যাদি নামেও পরিচিত । গনেশ তাঁর বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ হলেও তাঁর হস্তী মস্তকটি তাকে সর্বাধিক পরিচিতি দান করেছে। সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের দেবতারূপে গণেশের পূজা প্রচলিত এমনকি জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেও গণেশ ভক্তিবাদ মিশে গিয়ে দেবতা রূপে গণেশপূজার প্রথা বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করেছে।

প্রাক-বৈদিক ও বৈদিক যুগের দেবতাদের মধ্যে গণেশের গুণাবলী বিদ্যমান ছিল কিন্তু সেই গুণাবলী গণেশের উপর আরোপিত করে পৃথক দেবতারূপে তার পূজা প্রথম প্রসার লাভ করে গুপ্ত যুগে খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে। খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে হিন্দু ধর্মের অন্যতম শাখা স্মার্তসম্প্রদায়ের পাঁচজন দেবতার তালিকায় গণেশের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া গাণপত্য নামে একটি পৃথক গণেশ কেন্দ্রিক হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। এই সম্প্রদায়ে দেবতা গণেশ সর্বোচ্চ ঈশ্বররূপে পূজ্জিত হন। শুধুমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশেই নয়, ভারতের বাইরে চীন, ইন্দোনেশিয়া, জাপান তথা এশিয়ার অন্যান্য দেশেও এই দেবতার পূজার্চনার কথা জানা যায়।[১]

গণেশ শব্দটি একটি সংস্কৃত শব্দবন্ধ। 'গণ' ও 'ঈশ' এই শব্দদুটির সন্ধির মাধ্যমে গণেশ শব্দটির উৎপত্তি। 'গণ' শব্দের অর্থ একটি গোষ্ঠী, সমষ্টি বা বিষয়শ্রেণি। 'ঈশ' শব্দের অর্থ ঈশ্বর বা প্রভু। গণেশের নামের পরিপ্রেক্ষিতে 'গণ' শব্দটির মাধ্যমে বিশেষভাবে একই নামের একপ্রকার উপদেবতার গোষ্ঠীকে বোঝায়। এঁরা গণেশের পিতা শিবের অনুচরবর্গ। সাধারণভাবে 'গণ' বলতে বোঝায় একটি বিষয়শ্রেণি; শ্রেণি, গোষ্ঠী, সংঘ বা জনসমষ্টি। কোনো কোনো টীকাকারের মতে 'গণেশ' নামের অর্থ 'গোষ্ঠীর ঈশ্বর' বা 'পঞ্চভূত ইত্যাদি সৃষ্ট বিষয়সমূহের ঈশ্বর'। গণেশ নামের সমার্থক শব্দ গণপতি। গণ ও পতি শব্দ দু'টির মিলনের মাধ্যমে গণপতি শব্দটির উৎপত্তি। এখানে 'গণ' শব্দের অর্থ গোষ্ঠী এবং পতি শব্দের অর্থ 'শাসক বা প্রভু'। এই গণপতি শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে রচিত ঋগ্বেদ গ্রন্থের দ্বিতীয় মন্ডল এর ২৩ তম সূক্তের প্রথম শ্লোকে। তবে বৈদিক গণপতি শব্দের মাধ্যমে বিশেষভাবে দেবতা রূপে গণেশকে নির্দেশ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পন্ডিত মহলের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান।

ভারতীয় শিল্পকলায় গণেশ একটি জনপ্রিয় চরিত্র। অন্যান্য দেবদেবীদের তুলনায় গণেশের মূর্তির মধ্যে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য নিদর্শন বেশি লক্ষ্য করা যায়। দন্ডায়মান, নৃত্যরত, দৈত্যনাশে উদ্যত, শিশুরূপে পরিবারের সঙ্গে ক্রীড়ারত, মাটিতে বা সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় অথবা বিভিন্ন ধরনের আধুনিক অবস্থানেও দেবতা রূপে গণেশকে চিত্রিত করা হয়েছে। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গণেশের মূর্তি নির্মাণ প্রাধান্য লাভ করেছিল। গাণপত্য সম্প্রদায়ের একজন স্বাধীন দেবতার রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর খ্রিস্টীয় ৭০০ থেকে ১২০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে যেসব গণেশ মূর্তি নির্মিত হয়েছিল সেগুলি ছিল ১৩ শতাব্দীতে নির্মিত গণেশ ভাস্কর্যের আদর্শ স্থানীয়। প্রতাপাদিত্য পাল খ্রিস্টীয় ১২০০ শতাব্দীর গণেশ মূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন। উক্ত গনেশ মূর্তিটিতে দেখা যায় গণেশের মাথাটি হাতির এবং তার উদরটি স্ফীত। এই মূর্তিতে গণেশের চারটি হাতের উল্লেখ রয়েছে। গণেশের এই চতুর্ভুজ মূর্তিটি সর্বাধিক পরিচিত। গণেশের

Society Language and Culture

প্রাচীন মূর্তিগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শুঁড়টি বাঁদিকে বাঁকানো থাকে, যাতে গণেশ তাঁর নিজের বাঁহাতের মিষ্টান্নটি আস্বাদন করছেন সেটি বোঝা যায়। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ইলোরা গুহাসমূহে প্রাপ্ত একটি প্রাচীনতর মূর্তিতে গণেশের উপরিউক্ত রূপটি চিত্রিত হয়েছে।

গণপতির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীনতম হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদে। ঋকবেদে বৃহস্পতির উদ্দেশ্যেও গণপতি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে তাঁকে জেষ্ঠ্যরাজ বলা হয়েছে।[২] তিনি হলেন পুরোহিতদের প্রধান[৩] এবং তাঁকে সর্বজ্ঞানী পুরোহিতরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] তাঁর হাতে অঙ্কুশ বা কুঠার অস্ত্র থাকে।[৫] যা গণপতির প্রধান অস্ত্ররূপে পরিগণিত হয়েছে। স্কন্দ পুরাণে গণেশের বিশেষণে জেষ্ঠ্যরাজ বা জ্যেষ্ঠ শব্দের উল্লেখ রয়েছে।[৬] কিন্তু লিঙ্গ পুরাণে বৃহস্পতি এবং গণেশকে সম্পূর্ণ পৃথক দেবতারূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[৭] ঋগ্বেদে অগ্নির পরেই দেবতারূপে ইন্দ্রের স্থান। ঋকবেদের অন্যতম দেবতা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যেও গণপতি শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[৮] এছাড়া, মরুৎগণের পিতা রুদ্রের সঙ্গেও গণপতি শব্দটির সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ও মৈত্রায়নী সংহিতায় রুদ্রকে গণপতি রূপে সম্বর্ধিত করা হয়েছে।[৯] এছাড়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ব্রহ্মা এবং রুদ্রকে গণপতি রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে।[১০] তবে সমস্ত ক্ষেত্রেই গণপতি শব্দটি বিশেষণ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে তথাকথিত মরুৎ, রুদ্র, বৃহস্পতি, ইন্দ্র প্রমুখ দৈবসত্তার সঙ্গে গণপতির উৎসকে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত করা না গেলেও তাদের বিভিন্ন বিশেষণ এবং তাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যাবলী বিবর্তিত হয়ে অনেক ক্ষেত্রেই তা গণপতিসত্তার মধ্যে আরোপিত হয়েছিল।[১১] যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে সর্বপ্রথম গণপতি - বিনায়কের একক স্বীকৃতি পাওয়া যায়। এই গণপতি বিনায়কসত্তা রুদ্র ও ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্ট বলে উল্লিখিত হয়েছে। তাঁকে বিঘ্ন উৎপাদনের জন্যই গণদের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি থেকেই গণপতি প্রত্যক্ষভাবে শিব এবং পার্বতীর সঙ্গে যুক্ত হন।[১২] যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে গণেশকে প্রথমবার দুর্গার সন্তান বলে উল্লেখ করা হয়। বহু পুরাণে তাঁকে স্বয়ম্ভূ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার স্কন্ধের গণ বা পার্ষদদের অনেকে পশু বা পাখির মুখবিশিষ্ট ছিল। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের 'ভূমারা'তে এই ধরনের বহুগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। গণেশ অর্থাৎ গণ - ঈশের হস্তীমুখের এটিও একটি কারণ হতে পারে।

ভারতীয় শিল্প ও চিত্রকলায় গণপতি এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় মূর্তিকল্প। গণেশের নানা রূপের বর্ণনা যেমন পুরাণ ও ইতিহাসে পাওয়া গেছে তেমনি তার বিচিত্র ও বহুমুখী মূর্তিও ভারতীয় উপমহাদেশে এমনকি উপমহাদেশের বাইরেও নানা স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মূর্তিগুলি বিচিত্রভাবে রঞ্জিত। কোথাও তিনি দণ্ডায়মান, কোথাও তিনি অসুর বধকারী বীরযুবা, আবার কোথাও নিছক পূজাভিলাষী হয়ে উপবিষ্ট। জানা যায়, গণেশের মূর্তি প্রথম নির্মিত হয়েছিল শ্রীলঙ্কায় খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গণেশের মূর্তি নির্মিত হতে শুরু করে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকেই গণেশ এক লোকপুজ্য দেবতার আসন লাভ করে ও তাঁর বহু মূর্তি নির্মিত হতে শুরু করে।

বিগ্রহ রূপেও গণেশের নানা মূর্তি প্রচলন ছিল। এইসব মূর্তি সবই গুপ্ত যুগে নির্মিত হয়নি। নির্দিষ্ট গণপতির মূর্তি দ্বারা তাঁর পূজার্চনা গুপ্ত যুগের শেষ দিক থেকে শুরু হলেও এর বেশ কিছুকাল পর তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল বলে মনে করা হয়।[১৩] গুপ্ত যুগের প্রথম দিকে মথুরায় প্রাপ্ত বেলেমাটির গণপতি ও ভিতরগাঁও-এর ইষ্টক নির্মিত মন্দিরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির গণপতির মূর্তিটি গণেশ মূর্তির বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য বহন করছে। সেখানে গণেশের বাহনরূপে ইঁদুরের উপস্থিতি দেখা যায় না এবং ঠিক দেবতার আকারে

গণেশ চিত্রিত হয়নি। সেখানে তিনি উড্ডীয়মান। এছাড়া, গুপ্তযুগের প্রথম ভাগে ভিলসা উদয়গিরির চন্দ্রগুপ্ত গুহায় গণেশের যে উৎকীর্ণ চিত্রটি পাওয়া যায় সেটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই মূর্তি অনুসারে গণেশ পর্যঙ্ক আসনে উপবিষ্ট। বামহাতে তার মোদকভাণ্ড এবং এখানেও বাহনরূপে ইঁদুর অনুপস্থিত। উপবিষ্ট গণেশ মূর্তি প্রথম ও শেষ গুপ্তযুগে সারা ভারত ছড়িয়ে পড়ে। আরেক ধরনের গণেশ মূর্তি সন্ধান মেলে উড়িষ্যায় । তিনি নৃত্যগণেশ, অষ্টভুজ, নৃত্যের আবর্ত দেহে সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

গণেশের মূর্তি তাত্ত্বিক বর্ণনায় তার বাহনরূপে মূষিকের উল্লেখ রয়েছে।[১৪] গণেশের বাহন মূষিক বা ইঁদুর। ইঁদুর ধর্মের অবতার ও পূজাসিদ্ধির অনুকূল। অন্য একটি মতে সংস্কৃত মূষিক শব্দটি 'মুশ্' ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ চুরি করা। মনে করা হয়, গণেশের পদতলে বাহনরূপে মূষিকের অবস্থান গণেশ কর্তৃক বিঘ্নবিজয়ের প্রতীক মাত্র। দ্বাদশ শতকের আগে দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পরীতিতে গণেশের বাহনরূপে মূষিকের অন্তর্ভুক্তি ছিল না। যদিও উত্তর ভারতে এর অনেক আগে থেকেই গণেশের বাহনরূপে মূষিকের অন্তর্ভুক্তি দেখা যায়। আনুমানিক দশম- একাদশ শতকে নির্মিত উড়িষ্যার মুক্তেশ্বর মন্দিরে গণপতির বাহনরূপে মূষিকের অবতারণা করা হয়েছে, যা গণেশ বাহন মূষিকের প্রাথমিক উপস্থাপনার মধ্যে একটি।[১৫] গণেশের মূর্তিতাত্ত্বিক উপস্থাপনার মূল সংযোজনগুলির মধ্যে মূষিক সর্বশেষ সংযোজন। তবে গণেশের মূর্তিতে মূষিকের অন্তর্ভুক্তি পৌরাণিক গণপতি সত্ত্বার ক্রমবিকাশের শেষ পর্যায়েই হয়েছিল বলে মনে করা হয়। বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে প্রাপ্ত গণেশের মূর্তি বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর কোন বাহনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুযায়ী দেবী বসুন্ধরা গণেশকে বাহন রূপে মূষিকটি প্রদান করেন।
''পৃথ্বি মূষিকবাহনম্''।[১৬]

“বসুন্ধরা দদৌ তস্মৈ বানায় চ মূষিকম্”। [১৭]

সাধারণত, মূষিক বিভিন্ন ভাবে মাটি ও চাষের ক্ষতিকারক প্রাণী। ফলে , পৃথিবীর সঙ্গে মূষিকের মধুর সম্পর্ক ছিল না। সেই কারণেই কৃষি কাজের ক্ষতিকারক প্রাণী মূষিককে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দেবী বসুন্ধরা গণেশকে মূষিকটি প্রদান করেন। গণেশ বিঘ্ননাশকারী ছিলেন বলেই তাকে মূষিক বাহন তথা মূষিকের নিয়ন্ত্রণকারী রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। সংস্কৃত পরিভাষায় মূষক শব্দের অর্থ হলো তস্কর। আর মূষিক বা ইঁদুর চাষের জমিতে তস্কর বা মূষকের ভূমিকা পালন করে বলেও মনে করা হয়। এই ভিত্তিতে গণেশকে কৃষি দেবতারূপেও চিহ্নিত করা যায়। যিনি ইঁদুরের প্রকোপ থেকে চাষের জমিকে রক্ষা করতেন এবং ফসল ফলনে সহায়তা করতেন।[১৮]

স্কন্দপুরাণের প্রভাস খন্ড অনুযায়ী, গণেশের জন্মের পরে গণেশ জননী নিজ পুত্রকে মোদকপূর্ণ ভোজ্যপাত্র দিয়েছিলেন আর এই মোদকের গন্ধে মূষিক গর্ত থেকে বেরিয়ে গণেশকে প্রদত্ত সেই মোদক ভক্ষণ করে অমরত্ব লাভ করে এবং গণেশের বাহন হিসেবে গণপতির পদতলে বিরাজমান হয়।

"তস্য ভক্ষস্য গন্ধেন নিষ্ক্রান্তো মূষকো বিলাৎ।
ভক্ষণাচ্চামরো জাতস্তস্য বাহ্যো ব্যজায়ত।। "[১৯]
প্রকৃতপক্ষে, বাহনরূপে মূষিকটি গণেশ রুদ্রের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে গণেশের মূষিক শিববাহন বৃষের সঙ্গে অভিন্ন রূপে উল্লিখিত হয়েছে।
"বৃষাকার মহাকায় বিষরূপ মহাবল।

ধর্মরূপ বৃষস্তং হি গণেশস্য বাহনম্।
নমস্কারাম্যহম্ত্বাখো পূজাসিদ্ধিং প্রযচ্ছমে।। "[২০]
যজুর্বেদ অনুযায়ী, আখু বা মূষিক ছিল রুদ্রের প্রিয় পশু - 'এষতে রুদ্রভাগ আখুস্তে পশুঃ'[২১]- হে রুদ্র, এই তোমার ভাগ, আখু তোমার পশু। আচার্য মহীধর শুক্লযজুর্বেদের ব্যাখ্যায় লিখেছেন - তোমার আখু পশু অর্থাৎ মূষিককে পশুরূপে সমর্পণ করছি। মূষিক প্রদানের দ্বারা তুষ্ট রুদ্র অম্বিকার সঙ্গে একত্রে যজমানের পশুহিংসা করবেন না। শতপথব্রাহ্মণেও রুদ্রের পশু হিসেবে মূষিক তথা আখু নির্দিষ্ট হয়েছে- "তমাখুৎকর উপকিরত্যেষ তে রুদ্র ভাগ আখুস্তে পশুরিতি তদস্মা আখুমেব পশুনামনুদিশতি তে নো ইতরান্ পশূন্ ন হিনস্তি। "[২২]

রুদ্রের প্রিয় পশু মূষিক। রুদ্রের ক্রোধ নিবারনের জন্য মূষিকটি পশু হিসেবে উপহার দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে রুদ্র তাঁর সেই প্রিয় পশুটিকে অর্থাৎ মূষিকটিকে নিজ আত্মজ তথা গণেশকে উপঢৌকন হিসাবে দিয়েছিলেন এবং রুদ্রাত্মজ গণপতিও রুদ্রের প্রিয় মূষিকটিকে নিজে বহন করেছিলেন। মূল্যবান দ্রব্যাদি বিনষ্ট করতে মূষিকের তুলনা নাই। এই জন্য ধ্বংসের দেবতা রুদ্রের প্রিয় পশু মূষিক। বৃষবাহন রুদ্র গণপতি রূপে পৃথক আকার লাভ করলে বৃষের সঙ্গে অভিন্নরূপ মূষিক গণেশের বাহনত্ব লাভ করে। এক পাশ্চাত্য পন্ডিত গণেশের বাহন মূষিককে সর্বব্যাপী আত্মা রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে গণেশের হস্তিমুখ 'বিরাট' বা ভূমার প্রতীক, নরদেহ অল্প বা ক্ষুদ্রবস্তুর ইঙ্গিতবাহী এবং মূষিক ক্ষুদ্র ও বৃহতে সমভাবে বিরাজিত আত্মা, -'The mouse is the master of the inside of everything all-pervading Atman is the mouse that lives in the hole, intellect, within the heart of everything'.[২৩]

পুরাণশাস্ত্রে গণপতির পাশাপাশি তাঁর বাহনরূপে মূষিকেরও যথেষ্ট গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন লোকবিশ্বাসগুলিকে ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক কাঠামোতে বৈধতা প্রদানের জন্যই গণপতি ও তাঁর বাহন মূষিক সংক্রান্ত বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছিল। পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখন্ড ৭৪।২৬-৪৫) এইরকম একটি কাহিনী বিদ্যমান । কাহিনীটি হল- গণপতির সঙ্গে ত্রিপুরাসুরের যখন বিধ্বংসযুদ্ধ চলছিল সেই সময় অসুরগুরু শুক্রাচার্য তার ঔষধি বলে এক মহাপরাক্রমশালী গজ নির্মাণ করেন। সেই শক্তিশালী গজের দ্বারা দেবতাদের শত শত সৈন্য নিমেষে ধরাশায়ী হতে থাকে এবং সেই শক্তিশালী গজে আরোহন করে ত্রিপুরাসুর মহা পরাক্রমশালী দেবসেনানায়কদেরও নিমেষে পরাস্ত করতে থাকে। দেবতাদের সেই করুন অবস্থা দেখে গণেশ শর দিয়ে সেই শক্তিশালী হস্তীকে আঘাত করেন। আহত সেই গজ তখন তার দন্ত দ্বারা গণেশের বাহন ক্ষুদ্র মূষিককে আক্রমণ করে। এবং ঘটনা ক্রমে দেখা যায় গণেশের সেই ক্ষুদ্র বাহন মূষিকটি সেই পরাক্রমশালী হস্তীকে নিমেষেই ধরাশায়ী করতে সক্ষম হন আর গণপতি তাঁর সেই ক্ষুদ্র মূষিক বাহনে আরোহন করে দেবতাদের ত্রাস ত্রিপুরাসুরকে ববধ করেন। এই সমস্ত ঘটনা পর্যালোচনা করলে সহজেই অবগত হওয়া যায় যে দেবতা গণপতির বীরত্বগাঁথার ন্যায় তাঁর বাহন মূষিকেরও বীরত্বগাঁথা সসম্মানে উল্লেখিত হয়েছে। [২৪]

প্রাচীন ভারতে মূষিকদের উদ্দেশ্যে নির্মিত বিভিন্ন মন্দিরের কথা জানা যায়।[২৫] তবে সেই সব মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে সেইসব অঞ্চলের লোকবিশ্বাস এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রাচীন ভারতীয় গ্রামাঞ্চলে মূষিক তথা ইঁদুরকেন্দ্রিক লোককথা বা লোকবিশ্বাসের জন্মানোর নানারূপ কারণ ছিল। সাধারণত মূষিক মাঠের ফসল নষ্ট করে সাধারণ মানুষের প্রভূত ক্ষতিসাধন করত। মূষিকের এই ধ্বংসাত্মক স্বভাবই মূষিক ও গণেশের মধ্যে

Society Language and Culture

পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধন সৃষ্টি করে এবং বিঘ্নরাজের বাহন হিসাবে মূষিক শাস্ত্রীয় অনুমোদন লাভ করে।[২৬] অর্থাৎ, মূষিক দ্বারা উৎপন্ন বিঘ্ন ও সেই বিঘ্ন থেকে পরিত্রানের উপায় স্বরূপ মূষিকবাহন রূপে গণপতিকে উপস্থাপিত করা হয়। বলা বাহুল্য যে প্রাকৃতিক উপাদানকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করার যে রীতি আমরা বৈদিক সাহিত্যে লক্ষ্য করি তার প্রতিফলন এখানেও উপস্থিত।

তথ্যসূত্র:

১. গরুড় পুরাণ: আচারকান্ড অধ্যায় ১০১।

২. ঋগ্বেদ: ২।২৩।১ (গণানাং ত্ব গণপতিম্ হবামহে)।

৩. তদেব: ১।৪০।২; ২।২৪।৯; ২।১।৩; ৪।৫০।৮

৪. তদেব: ৫।৪৭।৯

৫. তদেব: ১০।৫৩।৯

৬. স্কন্দ পুরাণ: কাশী খন্ড ৫৭।১০২

৭. লিঙ্গ পুরাণ: ১১। ১১৭।১১

৮. ঋগ্বেদ: ৬ ।২১।১২; ১০।১১১। ৩

৯. তৈত্তিরীয় সংহিতা : ৪। ১।২।২; মৈত্রায়নী সংহিতা: ২।৭।২; ৩।১।৩

১০. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ: ১।২১; কৌষীতকি ব্রাহ্মণ : ৮।৫।৭।১-৩

১১. রায় , অদিতি, আদি মধ্যযুগীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির অভিযোজনে পদ্মপুরাণ, ফার্মা, কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮, পৃ:২৫৩

১২. যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি: ১।১১।২৮৫

১৩. J.N.Banerjea: Development of Hindu IconographyIconography, pp.151-152.

১৪. স্কন্দ পুরাণ: ৭।৩।৩২।২০- ২১; গণেশ পুরাণ: ক্রীড়াখণ্ড ১৩৪।১- ৪৪; পদ্মপুরাণ: সৃষ্টি খন্ড ৬৪।৪ক; ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ: গণপতিখন্ড ১৩।১২

১৫.G.Jounean Dubrevil: Iconography of southern India; Bhartiya Publishing House,Varanasi,1978, p.43.

১৬. বৃহদ্ধর্মপুরাণ; মধ্য খন্ড- ৩০। ৮২

১৭. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গণেশ খন্ড- ১৩। ১২

Society Language and Culture

১৮. B.A.Gupte: Harvest Festivals in Honour of Gouri and Ganesa: Indian Antiquary, vol.35,1906, p.63.

১৯. স্কন্দ পুরাণ; ৩২।১১

২০. কালী বিলাসতন্ত্র- ১৮। ২৫

২১. শুক্ল যজুর্বেদ; ৩।৫৩

২২. শতপথ ব্রাহ্মণ ২। ৫। ৩

২৩.ভট্টাচার্য, হংস নারায়ণ, হিন্দুদের দেব-দেবী, প্রথম খন্ড, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৭ পৃ:১৭৩

২৪.রায় , অদিতি, আদি মধ্যযুগীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির অভিযোজনে পদ্মপুরাণ, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৮ পৃ:৩১৩

২৫.তদেব

২৬.Asis Sen: Animal Motifs in Ancient Indian Art; Firma K.L. Mukherjee & Sons, Calcutta, 1973; p.61

গ্রন্থতালিকা:

১. চট্টোপাধ্যায়, দীপান্বিতা, গণপতি ভারতে ও বহির্ভারতে, বাণী লাইব্রেরী, কলকাতা,১৪১৫ বঙ্গাব্দ।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ, পঞ্চোপাসনা, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলকাতা,১৯৬০।

৩. বসু, গিরীন্দ্র শেখর, পুরাণ প্রবেশ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৯৩৪।

৪. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসংস্কৃতি ;প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট, আনন্দ প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৬।

৫. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০।

৬. ভট্টাচার্য, হংস নারায়ণ, হিন্দুদের দেব-দেবী, প্রথম খন্ড, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৭।

৭. রায় , অদিতি, আদি মধ্যযুগীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির অভিযোজনে পদ্মপুরাণ, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৮।

৮. রায়, যোগেশ চন্দ্র বিদ্যানিধি, পৌরাণিক উপাখ্যান, কলকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

৯. https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B6

Society Language and Culture